অনুরাধা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুরাধা

এক

কন্যার বিবাহযোগ্য বয়সের সম্বন্ধে যত মিথ্যা চালানো যায় চালাইয়াও সীমানা ডিঙাইয়াছে। বিবাহের আশাও শেষ হইয়াছে।—ওমা, সে কি কথা! হইতে আরম্ভ করিয়া চোখ টিপিয়া কন্যার ছেলেমেয়ের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিয়াও এখন আর কেহ রস পায় না, সমাজে এ রসিকতাও বাহুল্য হইয়াছে। এমনি দশা অনুরাধার। অথচ ঘটনা সে-যুগের নয়, নিতান্তই আধুনিককালের। এমন দিনেও যে কেবলমাত্র গণ-পণ, ঠিকুজি-কোষ্ঠী ও কুলশীলের যাচাই-বাছাই করিতে এমনটা ঘটিল—অনুরাধার বয়স তেইশ পার হইয়া গেল, বর জুটিল না—এ কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। তবু ঘটনা সত্য।

সকালে এই গল্পই চলিতেছিল আজ জমিদারের কাছারিতে। নূতন জমিদারের নাম হরিহর ঘোষাল, কলিকাতাবাসী—তাঁর ছোটছেলে বিজয় আসিয়াছে গ্রামে।

বিজয় মুখের চুরুটটা নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বললে, গগন চাটুয্যের বোন ? বাড়ি ছাড়বে না?

যে লোকটা খবর আনিয়াছিল সে কহিল, বললে—যা বলবার ছোটবাবু এলে তাঁকেই বলব।

বিজয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তার বলবার আছে কি! এর মানে তাদের বার করে দিতে আমাকে যেতে হবে নিজে। লোক দিয়ে হবে না ?

লোকটা চুপ করিয়া রহিল। বিজয় পুনশ্চ কহিল, বলবার তাঁর কিছুই নেই বিনোদ, কিছুই আমি শুনব না। তবু তাঁরি জন্যে আমাকেই যেতে হবে তাঁর কাছে—তিনি নিজে এসে দুঃখ জানাতে পারবেন না?

বিনোদ কহিল, আমি তাও বলেছিলাম। অনুরাধা বললে, আমিও ভদ্র-গেরস্থঘরের মেয়ে বিনোদদা, বাড়ি ছেড়ে যদি বার হতেই হয় তাঁকে জানিয়ে একেবারেই বার হয়ে যাব, বার বার বাইরে আসতে পারব না।

কি নাম বললে হে, অনুরাধা? নামের ত দেখি ভারী চটক—তাই বুঝি এখনো অহঙ্কার ঘুচল না?

আজ্ঞে না।

বিনোদ গ্রামের লোক, অনুরাধাদের দুর্দশার ইতিহাস সে-ই বলিতেছিল। কিন্তু অনতিপূর্ব ইতিহাসেরও একটা অতিপূর্ব ইতিহাস থাকে—সেইটা বলি।

এই গ্রামখানির নাম গণেশপুর, একদিন ইহা অনুরাধাদেরই ছিল, বছর-পাঁচেক হইল হাতবদল হইয়াছে। সম্পত্তির মুনাফা হাজার-দুয়ের বেশী নয়, কিন্তু অনুরাধার পিতা অমর চাটুয্যের চালচলন ছিল বিশ হাজারের মত। অতএব ঋণের দায়ে ভদ্রাসন পর্যন্ত গেল ডিক্রি হইয়া। ডিক্রি হইল, কিন্তু জারি হইল না; মহাজন ভয়ে থামিয়া রহিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন যেমন বড় কুলীন, তেমনি ছিল প্রচণ্ড তাঁর জপতপ ক্রিয়াকর্মের খ্যাতি। তলা-ফুটা সংসার-তরণী অপব্যয়ের লোনাজলে কানায়-কানায় পূর্ণ হইল, কিন্তু ডুবিল না। হিন্দুগোঁড়ামির পরিস্ফীত পালে সর্বসাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধার ঝোড়ো হাওয়া এই নিমজ্জিত-প্রায় নৌকাখানিকে ঠেলিতে ঠেলিতে দিল অমর চাটুয্যের আয়ুষ্কালের সীমানা উত্তীর্ণ করিয়া। অতএব চাটুয্যের জীবদ্দশাটা একপ্রকার ভালই কাটিল। তিনি মরিলেনও ঘটা করিয়া, শ্রাদ্ধশান্তিও নির্বাহিত হইল ঘটা করিয়া, কিন্তু সম্পত্তির পরিসমাপ্তি ঘটিলও এইখানে। এতদিন নাকটুকু মাত্র ভাসাইয়া যে তরণী কোনমতে নিঃশ্বাস টানিতেছিল, এইবার 'বাবুদের বাড়ি'র সমস্ত মর্যাদা লইয়া অতলে তলাইতে আর কালবিলম্ব করিল না।

পিতার মৃত্যুতে পুত্র গগন পাইল এক জরাজীর্ণ ডিক্রি-করা পৈতৃক বাস্তুভিটা, আকণ্ঠ ঋণ-ভারগ্রস্ত গ্রাম্য সম্পত্তি, গোটাকয়েক গরু-ছাগল-কুকুর-বিড়াল এবং ঘাড়ে পড়িল পিতার দ্বিতীয় পক্ষের অনূঢ়া কন্যা অনুরাধা।

এইবার পাত্র জুটিল গ্রামেরই এক ভদ্রব্যক্তি। গোটা পাঁচ-ছয় ছেলেমেয়ে ও নাতিপুতি রাখিয়া বছর-দুই হইল তাহার স্ত্রী মরিয়াছে, সে বিবাহ করিতে চায়।

অনুরাধা বলিল, দাদা, কপালে রাজপুত্র ত জুটল না, তুমি এইখানেই আমার বিয়ে দাও। লোকটার টাকাকড়ি আছে, তবু দুটো খেতে-পরতে পাব।

গগন আশ্চর্য হইয়া কহিল, সে কি কথা! ত্রিলোচন গাঙ্গুলির পয়সা আছে মানি, কিন্তু ওর ঠাকুরদাদা কুল ভেঙ্গে সতীপুরের চক্রবর্তীদের ঘরে বিয়ে করেছিল জানিস ? ওদের আছে কি ?

বোন বলিল, আর কিছু না থাক টাকা আছে। কুল নিয়ে উপোস করার চেয়ে দু-মুঠো ভাত-ডাল পাওয়া ভালো দাদা।

গগন মাথা নাড়িয়া বলিল, সে হয় না,—হবার নয়।

কেন নয় বল ত ? বাবা ও-সব মানতেন, কিন্তু তোমার ত কোন বালাই নেই।

এখানে বলা আবশ্যক পিতার গোঁড়ামি পুত্রের ছিল না। মদ্য-মাংস ও আরও একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত পুরুষ। পত্নী-বিয়োগের পরে ভিন্নপল্লীর কে একটি নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক আজও তাহার অভাব মোচন করিতেছে এ কথা সকলেই জানে।

গগন ইঙ্গিতটা বুঝিল, গর্জিয়া, বলিল, আমার বাজে গোঁড়ামি নেই, কিন্তু কন্যাগত কুলের শাস্ত্রাচার কি তোর জন্যে জলাঞ্জলি দিয়ে চোদ্দপুরুষ নরকে ডোবাব ? কৃষ্ণের সন্তান, স্বভাব-কুলীন আমরা—যা যা, এমন নোংরা কথা আর কখনো মুখে আনিস নে। এই বলিয়া সে রাগ করিয়া চলিয়া গেল, ত্রিলোচন গাঙ্গুলির প্রস্তাবটা এইখানেই চাপা পড়িল।

গগন হরিহর ঘোষালকে ধরিয়া পড়িল—কুলীন ব্রাহ্মণকে ঋণমুক্ত করিতে হইবে। কলিকাতায় কাঠের ব্যবসায়ে হরিহর লক্ষপতি ধনী। একদিন তাঁহার মাতুলালয় ছিল এই গ্রামে, বাল্যে বাবুদের বহু সুদিন তিনি চোখে দেখিয়াছেন, বহু কাজেকর্মে পেট ভরিয়া লুচিমণ্ডা আহার করিয়া গিয়াছেন, টাকাটা তাঁহার পক্ষে বেশী নয়, তিনি সম্মত হইলেন। চাটুয্যেদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া হরিহর গণেশপুর ক্রয় করিলেন, কুণ্ডুদের ডিক্রির টাকা দিয়া ভদ্রাসন ফিরাইয়া লইলেন, কেবল মৌখিক শর্ত এই রহিল যে, বাহিরের গোটা দুই-তিন ঘর কাছারির জন্য ছাড়িয়া দিয়া গগন অন্দরের দিকটায় যেমন বাস করিতেছে তেমনই করিবে।

তালুক খরিদ হইল, কিন্তু প্রজারা মানিতে চাহিল না। সম্পত্তি ক্ষুদ্র, আদায় সামান্য, সুতরাং বড় রকমের কোন ব্যবস্থা করা চলে না; কিন্তু, অল্পের মধ্যেই কি কৌশল যে গগন খেলিতে লাগিল, হরিহরের পক্ষের কোন কর্মচারী গিয়াই গণেশপুরে

টিঁকিতে পারিল না। অবশেষে গগনের নিজেরই প্রস্তাবে সে নিজেই নিযুক্ত হইল কর্মচারী; অর্থাৎ ভূতপূর্ব ভূস্বামী সাজিলেন বর্তমান জমিদারদের গোমস্তা। মহাল শাসনে আসিল, হরিহর হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিলেন, কিন্তু আদায়ের দিক দিয়া রহিল যথাপূর্বস্তথা পরঃ। এক পয়সা তহবিলে জমা পড়িল না। এমনিভাবে গোলেমালে আরও বছর-দুই কাটিল, তার পরে হঠাৎ একদিন খবর আসিল—গোমস্তাবাবু গগন চাটুয্যেকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সদর হইতে হরিহরের লোক আসিয়া খোঁজখবর তত্ত্বতল্লাস করিয়া জানিল আদায় যাহা হইবার হইয়াছে, সমস্তই গগন আত্মসাৎ করিয়া সম্প্রতি গা-ঢাকা দিয়াছে। পুলিশে ডায়রি, আদালতে নালিশ, বাড়ি খানাতল্লাশী প্রয়োজনীয় যাহা কিছু সবই হইল, কিন্তু না টাকা, না গগন কাহারও সন্ধান মিলিল না। গগনের ভগিনী অনুরাধা ও দূর-সম্পর্কের একটি ছেলেমানুষ ভাগিনেয় বাটীতে থাকিত, পুলিশের লোকে তাহাকে বিধিমত কষামাজা ও নাড়াচাড়া দিল, কিন্তু কোন তথ্যই বাহির হইল না।

বিজয় বিলাত-ফেরত। তাহার পুনঃ পুনঃ একজামিন ফেল করার রসদ যোগাইতে হরিহরকে অনেক টাকা গণিতে হইয়াছে। পাস করিতে সে পারে নাই, কিন্তু বিজ্ঞতার ফলস্বরূপ মেজাজ গরম করিয়া বছর-দুই পূর্বে দেশে ফিরিয়াছে। বিজয় বলে, বিলাতে পাস-ফেলের কোন প্রভেদ নাই। বই মুখস্থ করিয়া পাস করিতে গাধাতেও পারে, সে উদ্দেশ্য থাকিলে সে এখানে বসিয়াই বই মুখস্থ করিত, য়ুরোপে যাইত না। বাড়ি আসিয়া সে পিতার কাঠের ব্যবসায়ের কাল্পনিক দুরবস্থায় শঙ্কা প্রকাশ করিল এবং এই নড়বড়ে, পড়ো-পড়ো কারবার ম্যানেজ করিতে আত্মনিয়োগ করিল। কর্মচারী মহলে ইতিমধ্যেই নাম হইয়াছে,—কেরানীরা তাহাকে বাঘের মত ভয় করে। কাজের চাপে যখন নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই এমনি সময়ে আসিয়া পৌঁছিল গণেশপুরের বিবরণ। সে কহিল, এ ত জানা কথা, বাবা যা করবেন তা এইরকম হতে বাধ্য। কিন্তু উপায় নাই, অবহেলা করিলে চলিবে না—তাহাকে সরেজমিনে নিজে গিয়া একটি বিহিত করিতেই হইবে। এইজন্যই তাহার গণেশপুরে আসা। কিন্তু এই ছোট কাজে বেশীদিন পল্লীগ্রামে থাকা চলে না, যত শ্রীঘ্র সম্ভব একটা ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে। সমস্তই যে একা তাহারি মাথায়। বড়ভাই অজয় এটর্নি। অত্যন্ত স্বার্থপর, নিজের অফিস ও স্ত্রী-পুত্র লইয়াই ব্যস্ত, সংসারের সকল বিষয়েই অন্ধ, শুধু ভাগাভাগির ব্যাপারে তাহার একজোড়া চক্ষু দশজোড়ার কাজ করে। স্ত্রী প্রভাময়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, বাড়ির লোকজনের সংবাদ লওয়া ত দূরের কথা, শ্বশুর-শাশুড়ী বাঁচিয়া আছে কি না খবর লইবারও সে বেশী অবকাশ পায় না। গোটা পাঁচ-ছয় ঘর লইয়া বাটীর যে অংশে তাহার মহল সেখানে পরিজনবর্গের গতিবিধি সঙ্কুচিত, তাহার ঝি-চাকর আলাদা—উড়ে বেহারা আছে। শুধু বুড়া কর্তার অত্যন্ত নিষেধ থাকায় আজও মুসলমান বাবুর্চি নিযুক্ত হইতে পারে নাই। এই অভাবটা প্রভাকে পীড়া দেয়। আশা আছে শ্বশুর মরিলেই ইহার প্রতিকার হইবে। দেবর বিজয়ের প্রতি তাহার চিরদিনই অবজ্ঞা, শুধু বিলাত প্রত্যাবর্তনের পরে মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। দুই-চারিদিন নিমন্ত্রণ করিয়া নিজে রাঁধিয়া ডিনার খাওয়াইয়াছে, সেখানে ছোটবোন অনিতার সহিত বিজয়ের পরিচয় হইয়াছে। সে এবার বি. এ. পরীক্ষায় অনার্সে পাস করিয়া এম. এ. পড়ার আয়োজন করিতেছে।

বিজয় বিপত্নীক। স্ত্রী মরার পরেই সে বিলাত যায়। সেখানে কি করিয়াছে না করিয়াছে, খোঁজ করিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু ফিরিয়া পর্যন্ত অনেকদিন দেখা গিয়াছে স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে তাহার মেজাজটা কিছু রুক্ষ। মা বিবাহের কথা বলায় সে জোর গলায় আপত্তি জানাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল। তখন হইতে অদ্যাবধি প্রসঙ্গটা গোলেমালেই কাটিয়াছে।

গণেশপুরে আসিয়া একজন প্রজার সদরের গোটা-দুই ঘর লইয়া বিজয় নূতন কাছারি ফাঁদিয়া বসিয়াছে। সেরেস্তার কাগজপত্র গগনের গৃহে যাহা পাওয়া গিয়াছে জোর করিয়া এখানে আনা হইয়াছে এবং এখন চেষ্টা চলিতেছে তাহার ভগিনী অনুরাধা এবং দূরসম্পর্কের সেই ভাগিনেয় ছোঁড়াটাকে বহিষ্কৃত করার। বিনোদ ঘোষের সহিত এইমাত্র সেই পরামর্শই হইতেছিল।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময়ে বিজয় তাহার সাত-আট বছরের ছেলে কুমারকে সঙ্গে আনিয়াছে।

পল্লীগ্রামের সাপ-খোপ বিছা-ব্যাঙের ভয়ে মা আপত্তি করিলে বিজয় বলিয়াছিল, মা, তোমার বড়বৌয়ের প্রসাদে তোমার নাড়ুগোপাল নাতি-নাতনীর অভাব নেই, কিন্তু এটাকে আর তা ক'রো না। আপদে-বিপদে মানুষ হতে দাও।

শুনা যায়, বিলাতের সাহেবরাও নাকি ঠিক এমনিই বলিয়া থাকে। কিন্তু সাহেবদের কথা ছাড়াও এ-ক্ষেত্রে একটু গোপন ব্যাপার আছে। বিজয় যখন বিলাতে, তখন মাতৃহীন ছেলেটার একটু অযত্নেই দিন গিয়াছে। তাহার ভগ্নস্বাস্থ্য পিতামহী অধিকাংশ সময়েই থাকেন শয্যাগত, সুতরাং যথেষ্ট বিত্ত-বিভব থাকা সত্ত্বেও কুমারকে দেখিবার কেহ ছিল না, কাজেই দুঃখে-কষ্টেই সে বেচারা বড় হইয়াছে। বিলাত হইতে বাড়ি ফিরিয়া এই খবরটা বিজয়ের কানে গিয়াছিল।

গণেশপুরে আসিবার কালে বৌদিদি হঠাৎ দরদ দেখাইয়া বলিয়াছিল, ছেলেটা সঙ্গে যাচ্চে ঠাকুরপো, পাড়াগাঁ জায়গা একটু সাবধানে থেকো। কবে ফিরবে?

যত শ্রীঘ্র পারি।

শুনেচি আমাদের সেখানে একটা বড় বাড়ি আছে—বাবা কিনেছিলেন।

কিনেছিলেন, কিন্তু কেনা মানেই থাকা নয় বৌদি। বাড়ি আছে কিন্তু দখল নেই।

কিন্তু তুমি যখন নিজে যাচ্ছো ঠাকুরপো, তখন দখলে আসতেও দেরি হবে না।

আশা ত তাই করি।

দখলে এলে কিন্তু একটা খবর দিও।

কেন বৌদি?

ইহার উত্তরে প্রভা বলিয়াছিল, এই ত কাছে, পাড়াগাঁ কখনো চোখে দেখিনি, গিয়ে একদিন দেখে আসব। অনুরও কলেজ বন্ধ, সেও হয়ত সঙ্গে যেতে চাইবে।

এ প্রস্তাবে বিজয় অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিয়াছিল, আমি দখল নিয়েই তোমাকে খবর পাঠাব বৌদি, তখন কিন্তু না বলতে পাবে না। বোনটিকে সঙ্গে নেওয়া চাই।

অনিতা যুবতী, সে দেখিতে সুশ্রী ও অনার্সে বি. এ. পাস করিয়াছে। সাধারণ স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে বিজয়ের বাহ্যিক অবজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও রমণী-বিশেষের একাধারে এতগুলা গুণ সে মনে মনে যে তুচ্ছ করে তাহা নয়। সেখানে শান্ত পল্লীর নির্জন প্রান্তরে কখনো,—কখনো বা প্রাচীন বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথের একান্তে সহসা মুখোমুখি আসিয়া পড়ার সম্ভাবনা তাহার মনের মধ্যে সেদিন বার বার করিয়া দোল দিয়া গিয়াছিল।

দুই

বিজয়ের পরনে খাঁটি সাহেবি পোশাক, মাথায় শোলার টুপি, মুখে কড়া চুরুট, পকেটে রিভলবার, চেরির ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাবুদের বাড়ির সদর-বাটীতে আসিয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গে মস্ত লাঠি-হাতে দু'জন হিন্দুস্থানী দরোয়ান, অনেকগুলি অনুগত প্রজা, বিনোদ ঘোষ ও পুত্র কুমার। সম্পত্তি দখল করার ব্যাপারে যদিচ হাঙ্গামার ভয় আছে, তথাপি ছেলেকে নাড়ুগোপাল করার পরিবর্তে মজবুত করিয়া গড়িয়া তোলার এ হইল বড় শিক্ষা—তাই ছেলেও আসিয়াছে সঙ্গে। বিনোদ কিন্তু বরাবর ভরসা দিয়াছে যে, অনুরাধা একাকী স্ত্রীলোক, কোনমতেই জোরে পারিবে না। তবু রিভলবার যখন আছে তখন সঙ্গে লওয়াই ভালো।

বিজয় বলিল, মেয়েটা শুনেচি ভারী বজ্জাত, লোক জড়ো করে তুলতে পারে। ও-ই ত গগন চাটুয্যের পরামর্শদাতা। স্বভাব-চরিত্রও মন্দ।

বিনোদ বলিল, আজ্ঞে তা ত শুনিনি।

আমি শুনেচি।

কোথাও কেহ নাই, শূন্য প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বিজয় চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। বাবুদের বাড়ি বলা যায় বটে। সম্মুখে পূজার দালান এখনো ভাঙ্গে নাই, কিন্তু জীর্ণতার শেষ সীমায় পৌছিয়াছে। একপাশে সারি সারি বসিবার ঘর ও বৈঠকখানা—দশা একই। পায়রা, চড়াই ও চামচিকায় স্থায়ী আশ্রয় বানাইয়াছে।

দরোয়ান হাঁকিল, কোই হ্যায় ?

তাহার সম্ভ্রমবিহীন চড়া-গলার চীৎকারে বিনোদ ঘোষ ও অন্যান্য অনেকেই যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বিনোদ বলিল, রাধুদিদিকে আমি গিয়ে খবর দিয়ে আসচি বাবু। বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

তাহার কণ্ঠস্বর ও বলার ভঙ্গীতে বুঝা গেল, আজও এ-বাড়ির অমর্যাদা করিতে তাহাদের বাধে।

অনুরাধা রাঁধিতেছিল; বিনোদ গিয়া সবিনয়ে জানাইল, দিদি, ছোটবাবু বাইরে এসেছেন।

সে এ দুর্দৈব প্রত্যহই আশঙ্কা করিতেছিল। হাত ধুইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সন্তোষকে ডাকিয়া কহিল, বাইরে একটা সতরঞ্চি পেতে দিয়ে এসো বাবা, বল গে মাসীমা আসচেন। বিনোদকে বলিল, আমার বেশী দেরি হবে না—বাবু রাগ করেন না যেন বিনোদদা, আমার হয়ে তাঁকে বসতে বল গে।

বিনোদ লজ্জিত মুখে কহিল, কি করব দিদি, আমরা গরীব প্রজা, জমিদারে হুকুম করলে না বলতে পারিনে, কাজেই—

সে আমি বুঝি বিনোদদা।

বিনোদ চলিয়া গেল, বাহিরে সতরঞ্চি পাতা হইল, কিন্তু কেহ তাহাতে বসিল না। বিজয় ছড়ি ঘুরাইয়া পায়চারি করিতে করিতে চুরুট টানিতে লাগিল।

মিনিট-পাঁচেক পরে সন্তোষ বাহিরে আসিয়া ইঙ্গিতে দ্বারের প্রতি চাহিয়া সভয়ে কহিল, মাসীমা এসেছেন।

বিজয় থমকিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রঘরের কন্যা, তাহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করা উচিত, সে দ্বিধায় পড়িল। কিন্তু দৌর্বল্য প্রকাশ পাইলে চলিবে না, অতএব পরুষকণ্ঠে অন্তরালবর্তিনীর উদ্দেশ্যে কহিল, এ বাড়ি আমাদের তুমি জানো ?

উত্তর আসিল, জানি।

তবে ছেড়ে দিচ্চো না কেন ?

অনুরাধা তেমনি আড়ালে দাঁড়াইয়া বোনপোর জবানি বক্তব্য বলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ছেলেটা চালাক-চৌকস নয়, নূতন জমিদারের কড়া মেজাজের জনশ্রুতিও তাহার কানে পৌছিয়াছে, ভয়ে ভয়ে কেবলি থতথত খাইতে লাগিল, একটা কথাও সুস্পষ্ট হইল না।

বিজয় মিনিট পাঁচ-ছয় ধৈর্য ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল, তার পরে হঠাৎ একটা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, তোমার মাসীর বলার কিছু থাকলে সামনে এসে বলুক। নষ্ট করার সময় আমার নেই—আমি বাঘ-ভালুকও নয়, তাকে খেয়ে ফেলব না। বাড়ি ছাড়বে না কেন বলুক।

অনুরাধা বাহিরে আসিল না, কিন্তু কথা কহিল। সন্তোষের মুখে নয়, নিজের মুখে স্পষ্ট করিয়া বলিল, বাড়ি ছাড়ার কথা ছিল না। আপনার বাবা হরিহরবাবু বলেছিলেন, এর ভেতরের অংশে আমরা বাস করতে পারি।

কোন লেখাপড়া আছে ?

না নেই। কিন্তু তিনি এখনো জীবিত, তাঁকে জিজ্ঞেসা করলেই জানতে পারবেন।

জিজ্ঞেসা করার গরজ আমার নেই। এই যদি শর্ত তাঁর কাছে লিখে নাওনি কেন ?

দাদা বোধ হয় প্রয়োজন মনে করেন নি। তাঁর মুখের কথার চেয়ে লিখে নেওয়া বড় হবে এ হয়ত দাদার মনে হয়নি।

এ কথার সঙ্গত উত্তর বিজয় খুঁজিয়া পাইল না, চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই জবাব আসিল ভিতর হইতেই।

অনুরাধা কহিল, কিন্তু দাদা নিজের শর্ত ভঙ্গ করায় এখন সকল শর্তই ভেঙ্গে গেছে। এ-বাড়িতে থাকবার অধিকার আর আমাদের নেই। কিন্তু আমি একা স্ত্রীলোক, আর এই অনাথ ছেলেটি। ওর মা-বাপ নেই, আমি মানুষ করচি, আমাদের এই দুর্দশায় দয়া করে দু'দিন থাকতে না দিলে একলা হঠাৎ কোথায় যাই এই আমার ভাবনা।

বিজয় বলিল, এ জবাব কি আমার দেবার ? তোমার দাদা কোথায় ?

মেয়েটি বলিল, আমি জানিনে তিনি কোথায়। কিন্তু আপনার সঙ্গে যে এতদিন দেখা করতে পারিনি সে শুধু এই ভয়ে, পাছে আপনি বিরক্ত হন। এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বোধ করি সে নিজেকে সামলাইয়া লইল, কহিল, আপনি মনিব, আপনার কাছে কিছুই লুকোব না। অকপটে আমাদের বিপদের কথা জানালুম, নইলে একটা দিনও জোর করে এ-বাড়িতে বাস করার দাবী আমি করিনে। এই ক'টা দিন বাদে আমরা আপনিই চলে যাব।

তাহার কণ্ঠস্বরে বাহিরে হইতেও বুঝা গেল মেয়েটির চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। বিজয় দুঃখিত হইল, মনে মনে খুশীও হইল। সে ভাবিয়াছিল ইহাকে বে-দখল করিতে না জানি কত সময় ও কত হাঙ্গামাই পোহাইতে হইবে. কিন্তু কিছুই হইল না, সে অশ্রুজলে শুধু দয়া ভিক্ষা চাহিল। তাহার পকেটের পিস্তল এবং দরোয়ানদের লাঠিসোঁটা তাহাকে গোপনে তিরস্কার করিল,

কিন্তু দুর্বলতা প্রকাশ করাও চলে না। বলিল, থাকতে দিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাড়িতে আমার নিজের বড় দরকার। যেখানে আছি সেখানে খুব অসুবিধে, তা ছাড়া আমাদের বাড়ির মেয়েরা একবার দেখতে আসতে চান।

মেয়েটি বলিল, বেশ ত আসুন না। বাইরের ঘরগুলোতে আপনি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন, এবং ভিতরে দোতলায় অনেকগুলো ঘর। মেয়েরা অনায়াসে থাকতে পারবেন, কোন কষ্ট হবে না। আর বিদেশে তাঁদের ত লোকের আবশ্যক, আমি অনেক কাজ করে দিতে পারব।

এবার বিজয় সলজ্জে আপত্তি করিয়া কহিল, না না, সে কি কখনো হতে পারে। তাঁদের সঙ্গে লোকজন সবাই আসবে, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কিন্তু ভিতরের ঘরগুলো কি আমি একবার দেখতে পারি?

উত্তর হইল, কেন পারবেন না, এ ত আপনারই বাড়ি। আসুন।

ভিতরে ঢুকিয়া বিজয় পলকের জন্য তাহার সমস্ত মুখখানি দেখিতে পাইল। মাথায় কাপড় আছে কিন্তু ঘোমটায় ঢাকা নয়। পরনে একখানি আধময়লা আটপৌরে কাপড়, গায়ে গহনা নাই, শুধু দু'হাতে কয়েকগাছি সোনার চুড়ি—সাবেক কালের। আড়াল হইতে তাহার অশ্রু-সিঞ্চিত কণ্ঠস্বর বিজয়ের কানে বড় মধুর ঠেকিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, মানুষটিও হয়ত এমনি হইবে। বিশেষতঃ, দরিদ্র হইলেও সে ত বড়ঘরের মেয়ে, কিন্তু দেখিতে পাইল তাহার পত্যাশার সঙ্গে কছুই মিলিল না। রঙ ফরসা নয়, মাজা শ্যাম। বরঞ্চ একটু কালোর দিকেই। সাধারণ পল্লীগ্রামের মেয়ে আরও পাঁচজনকে যেমন দেখিতে তেমনি। শরীর কৃশ কিন্তু বেশ দৃঢ় বলিয়াই মনে হয়। শুইয়া বসিয়া ইহার আলস্যে দিন কাটে নাই তাহাতে সন্দেহ হয় না। শুধু বিশেষত্ব চোখে পড়িল ইহার ললাটে—একেবারে আশ্চর্য নিখুঁত গঠন।

মেয়েটি কহিল, বিনোদদা, বাবুকে তুমি সব দেখিয়ে আনো, আমি রান্নাঘরে আছি।

তুমি সঙ্গে যাবে না রাধুদিদি?

না।

উপরে উঠিয়া বিজয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত দেখিল। ঘর অনেকগুলি। সাবেক কালের অনেক আসবাব এখনো ঘরে ঘরে, কতক ভাঙ্গিয়াছে, কতক ভাঙ্গার পথে। এখন তাহাদের মূল্য সামান্যই, কিন্তু একদিন ছিল। সদরবাটীর মত এ-ঘরগুলিও জরাজীর্ণ, হাড়পাঁজরা বার করা। দারিদ্র্যের দাগ সকল বস্তুতেই গাঢ় হইয়া পড়িয়াছে।

বিজয় নীচে নামিয়া আসিলে অনুরাধা রান্নাঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দরিদ্র ও দুর্দশাপন্ন হইলেও ভদ্রঘরের মেয়ে, এবার তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতে বিজয়ের লজ্জা করিল, কহিল, আপনি কতদিন এ-বাড়িতে থাকতে চান?

ঠিক করে ত এখুনি বলতে পারিনে, যে-ক'টা দিন দয়া করে আপনি থাকতে দেন।

দিন-কয়েক পারি, কিন্তু বেশীদিন ত পারব না। তখন কোথায় যাবেন?

সেই চিন্তাই ত দিনরাত করি।

লোকে বলে, আপনি গগন চাটুয্যের ঠিকানা জানেন।

তারা আর কি বলে?

বিজয় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। অনুরাধা কহিল, জানিনে তা আপনাকে আগেই বলেচি, কিন্তু জানলেও নিজের ভাইকে ধরিয়ে দেব এই কি আপনি আদশে করেন?

তাহার কণ্ঠস্বরে তিরস্কার মাখানো। বিজয় ভারী অপ্রতিভ হইল, বুঝিল আভিজাত্যের চিহ্ন ইহার মন হইতে এখনো বিলুপ্ত হয় নাই। বলিল, না সে কাজ আপনাকে আমি করতে বলিনে, পারি নিজেই খুঁজে বার করব, তাকে পালাতে দেব না। কিন্তু এতকাল ধরে সে যে আমাদের এই সর্বনাশ করছিল—এও কি আপনি জানতে পারেন নি বলতে চান?

কোন উত্তর আসিল না।

বিজয় বলিতে লাগিল, সংসারে কৃতজ্ঞতা বলে ত একটা কথা আছে। নিজের ভাইকে এটুকু পরামর্শ কি কোনদিন দিতে পারেন নি? আমার বাবা নিতান্ত নিরীহ মানুষ, আপনাদের বংশের প্রতি তাঁর অত্যন্ত মমতা, বিশ্বাসও ছিল তেমনি বড়, তাই গগনকেই দিয়েছিলেন সমস্ত সঁপে, এ কি তারই প্রতিফল? কিন্তু নিশ্চিত জানবেন আমি দেশে থাকলে কখনও এমন ঘটতে পারত না।

অনুরাধা নীরব। কোন কথারই জবাব পাইল না দেখিয়া বিজয় মনে মনে আবার উষ্ণ হইয়া উঠিল। তাহার যেটুকু করুণা জন্মিয়াছিল সমস্ত উবিয়া গেল, কঠিন হইয়া বলিল, সবাই জানে আমি কড়া লোক, বাজে দয়ামায়া করিনে, দোষ করে আমার হাতে কেউ রেহাই পায় না, দাদার সঙ্গে দেখা হলে এটুকু অন্ততঃ তাকে জানিয়ে দেবেন।

অনুরাধা তেমনি মৌন হইয়া রহিল।

বিজয় কহিল, আজ সমস্ত বাড়িটার আমি দখল নিলাম। বাইরের ঘরগুলো পরিষ্কার হলে দিন-দুই পরে এখানে চলে আসব, মেয়েরা আসবেন তার পরে। আপনি নীচের একটা ঘরে থাকুন যে ক'দিন না যেতে পারেন, কিন্তু কোন জিনিসপত্র সরাবার চেষ্টা করবেন না।

কুমার বলিল, বাবা, তেষ্টা পেয়েচে আমি জল খাব।

এখানে জল পাব কোথায়?

অনুরাধা হাত নাড়িয়া ইশারায় তাহাকে কাছে ডাকিল, রান্নাঘরের ভিতরে আনিয়া কহিল, ডাব আছে খাবে বাবা?

হাঁ খাব।

সন্তোষ কাটিয়া দিতে ছেলেটা পেট ভরিয়া শাঁস ও জল খাইয়া বাহিরে আসিল, কহিল, বাবা তুমি খাবে? খুব মিষ্টি?

না।

খাও না বাবা, অনেক আছে। সব তো আমাদের।

কথাটা কিছুই নয়, তথাপি এতগুলি লোকের মধ্যে ছেলের মুখ হইতে কথাটা শুনিয়া হঠাৎ কেমন তাহার লজ্জা করিয়া উঠিল, কহিল, না না খাব না, তুই চলে আয়।

তিন

বাবুদের বাড়ির সদর অধিকার করিয়া বিজয় চাপিয়া বসিল। গোটা-দুই তাহার নিজের জন্য, বাকীগুলা হইল কাছারি। বিনোদ ঘোষ কোন একসময়ে জমিদারী সেরেস্তায় চাকরি করিয়াছিল, সেই সুপারিশে নিযুক্ত হইল নূতন গোমস্তা। কিন্তু ঝঞ্ঝাট মিটিল না। প্রধান কারণ, গগন চাটুয্যে টাকা আদায় করিয়া হাতে হাতে রসিদ লিখিয়া দেওয়া অপমানকর জ্ঞান করিত, যেহেতু তাহাতে

অবিশ্বাসের গন্ধ আছে—সেটা চাটুয্যে-বংশের অগৌরব। সুতরাং তাহার অন্তর্ধানের পরে প্রজারা বিপদে পড়িয়াছে, মৌখিক সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া নিত্যই হাজির হইতেছে, কাঁদা-কাটা করিতেছে,—কে কত দিয়াছে কত বাকী রাখিয়াছে নিরূপণ করা একটা কষ্টসাধ্য জটিল ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বিজয় যত শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিবে মনে করিয়াছিল তাহা হইল না, একদিন দুইদিন করিয়া দশ-বারোদিন কাটিয়া গেল। এদিকে ছেলেটা হইয়াছে সন্তোষের বন্ধু, বয়সে তিন-চার বছরের ছোট, সামাজিক ও সাংসারিক ব্যবধানও অত্যন্ত বৃহৎ, কিন্তু অন্য সঙ্গীর অভাবে সে মিশিয়া গেছে ইহারই সঙ্গে। ইহারই সঙ্গে থাকে বাটীর ভিতরে, ঘুরিয়া বেড়ায় বাগানে বাগানে নদীর ধারে—কাঁচা আম কুড়াইয়া পাখির বাসা খুঁজিয়া। খায় অধিকাংশ সময়ে সন্তোষের মাসীর কাছে, ডাকে তাহারি দেখাদেখি মাসীমা বলিয়া। বাহিরে টাকাকড়ি হিসাব-পত্র লইয়া বিজয় বিব্রত, সকল সময়ে ছেলের খোঁজ করিতে পারে না, যখন পারে তখন তাহার দেখা মিলে না। হঠাৎ কোনদিন হয়ত বকাঝকা করে, রাগ করিয়া কাছে বসাইয়া রাখে, কিন্তু ছাড়া পাইলেই ছেলেটা দৌড় মারে মাসীমার রান্নাঘরে। সন্তোষের পাশে বসিয়া খায় দুপুরবেলা ভাত, বিকালে তাহারি সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া লয় রুটি ও নারিকেল-নাড়ু।

সেদিন বিকালে লোকজন তখনো কেহ আসিয়া পৌঁছায় নাই, বিজয় চা খাইয়া চুরুট ধরাইয়া ভাবিল নদীর ধারটা খানিক ঘুরিয়া আসে। হঠাৎ মনে পড়িল সমস্তদিন ছেলেটার দেখা নাই। পুরাতন চাকরটা দাঁড়াইয়া ছিল, জিজ্ঞাসা করিল, কুমার কোথায় রে?

সে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, বাড়ির মধ্যে।

ভাত খেয়েছিল?

না।

জোর করে ধরে এনে খাওয়াস নে কেন?

এখানে খেতে চায় না, রাগ করে ছড়িয়ে ফেলে দেয়।

কাল থেকে আমার সঙ্গে ওর খাবার জায়গা করে দিস, এই বলিয়া কি ভাবিয়া আর সে বেড়াইতে গেল না, সোজা ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল। সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণের অপর প্রান্ত হইতে পুত্রের কণ্ঠস্বর কানে গেল—মাসীমা, আর একখানা রুটি আর দুটো নারকেল নাড়ু—শিগগির!

যাহাকে আদেশ করা হইল সে কহিল, নেবে আয় না বাবা, তোদের মত আমি কি গাছে উঠতে পারি?

জবাব হইল—পারবে মাসীমা, কিছু শক্ত নয়। এই মোটা ডালটায় পা দিয়ে ওই ছোট ডালটা ধরে এক টান দিলেই উঠে পড়বে।

বিজয় কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রান্নাঘরের সম্মুখে একটা বড় আম-গাছ, তাহার দু'দিকের দুই মোটা ডালে বসিয়া কুমার ও বন্ধু সন্তোষ। পা ঝুলাইয়া গুঁড়িতে ঠেস দিয়া উভয়ের ভোজনকার্য চলিতেছে, তাহাকে দেখিয়া দু'জনেই ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অনুরাধা রান্নাঘরের দ্বারের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, ওই কি ওদের খাবার জায়গা নাকি?

কেহ উত্তর দিল না। বিজয় অন্তরালবর্তিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আপনার ওপর দেখচি ও খুব অত্যাচার করচে।

এবার অনুরাধা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, বলিল, হাঁ।

তবু ত প্রশয় কম দিচ্চেন না, —কেন দিচ্চেন?

না দিলে আরও বেশী উপদ্রব করবে সেই ভয়ে।

কিন্তু বাড়িতে ত এ-রকম উৎপাত করে না শুনেচি।

হয়ত করে না। ওর মা নেই, ঠাকুরমা প্রায়ই শয্যাগত, বাপ থাকেন বাইরে কাজকর্ম নিয়ে, উৎপাত করবে কার ওপর?

বিজয় ইহা জানে না তাহা নয়, তথাপি ছেলেটার যে মা নাই এই কথাটা পরের মুখে শুনিয়া তাহার ক্লেশ বোধ হইল, কহিল, আপনি দেখচি অনেক বিষয় জানেন, কে বললে আপনাকে? কুমার?

অনুরাধা ধীরে ধীরে কহিল, বলবার বয়েস ওর হয়নি, তবু ওর মুখ থেকেই শুনতে পাই। দুপুরবেলা রোদ্দুরে ওদের আমি বেরোতে দিইনে, তবু ফাঁকি দিয়ে পালায়। যেদিন পারে না আমার কাছে শুয়ে বাড়ির গল্প করে।

বিজয় তাহার মুখ দেখিতে পাইল না, কিন্তু সেই প্রথম দিনটির মত আজো সেই কণ্ঠস্বর বড় মধুর লাগিল; তাই বলার জন্য নয়, কেবল শোনার জন্যই কহিল, এবার বাড়ি ফিরে গিয়ে ওর মুশকিল হবে।

কেন?

তার কারণ উপদ্রব জিনিসটা নেশার মত। না পেলে কষ্ট হয়, শরীর আইঢাই করে। কিন্তু সেখানে ওর নেশার খোরাক যোগাবে কে? দু'দিনেই ত পালাই পালাই করবে।

অনুরাধা আস্তে আস্তে বলিল, না, ভুলে যাবে—কুমার নেবে এসো বাবা, রুটি নিয়ে যাও।

কুমার বাটি হাতে করিয়া নামিয়া আসিল এবং মাসীর হাত হইতে আরও কয়েকটা রুটি ও নারিকেল-নাড়ু লইয়া তাঁহারই গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আহার করিতে লাগিল, গাছে উঠিল না। বিজয় চাহিয়া দেখিল, সেগুলি তাহাদের ধনীগৃহের তুলনায় পদগৌরবে যেমনি হীন হউক, সত্যকার মর্যাদায় কিছুমাত্র খাটো নয়। কেন যে ছেলেটা মাসীর রান্নাঘরের প্রতি এত আসক্ত বিজয় তাহার কারণ বুঝিল। সে ভাবিয়া আসিয়াছিল কুমারের লুব্ধতায় তাঁহার অহেতুক ও অতিরিক্ত ব্যয়ের কথা তুলিয়া প্রচলিত শিষ্টবাক্যে পুত্রের জন্য সঙ্কোচ প্রকাশ করিবে এবং করিতেও যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল। কুমার বলিল, মাসীমা, কালকের মত চন্দ্রপুলি করতে আজও যে তোমাকে বলেছিলুম, করোনি কেন?

মাসীমা কহিল, অন্যায় হয়ে গেছে বাবা, সাবধান হইনি। সমস্ত দুধ বেড়ালে উলটে ফেলে দিয়েছে—কাল আর এমন হবে না।

কোন বিড়ালটা বল ত? সাদাটা?

সেইটেই বোধ হয়, বলিয়া অনুরাধা হাত দিয়া তাহার মাথার এলোমেলো চুলগুলি সোজা করিয়া দিতে লাগিল।

বিজয় কহিল, উৎপাত ত দেখচি ক্রমশঃ জুলুমে গিয়ে ঠেকেচে।

কুমার বলিল, খাবার জল কৈ?

ঐ যাঃ, ভুলে গেছি বাবা, এনে দিচ্চি।

তুমি সবই ভুলে যাও মাসীমা। তোমার কিছু মনে থাকে না।

বিজয় বলিল, আপনার বকুনি খাওয়াই উচিত। ত্রুটি পদে পদে।

হাঁ, বলিয়া অনুরাধা হাসিয়া ফেলিল। অসতর্কতাবশতঃ এ-হাসি বিজয়ের চোখে পড়িল। পুত্রের অবৈধ আচরণের ক্ষমাভিক্ষা করা আর হইল না, পাছে তাহার ভদ্রবাক্য অভদ্র ব্যঙ্গের মত শুনায়, পাছে এই মেয়েটির মনে হয় তাহার দৈন্য ও দুর্দশাকে সে কটাক্ষ করিতেছে।

পরদিন দুপুরবেলা অনুরাধা কুমার ও সন্তোষকে ভাত বাড়িয়া দিয়া তরকারি পরিবেশন করিতেছে, তাহার মাথার কাপড় খোলা, গায়ের বস্ত্র অসংবৃত, অকস্মাৎ দ্বারপ্রান্তে মানুষের ছায়া পড়িতে অনুরাধা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, ছোটবাবু। শশব্যস্তে মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় বলিল, একটা অত্যন্ত জরুরী পরামর্শের জন্য আপনার কাছে এলুম। বিনোদ ঘোষ গ্রামের লোক, অনেকদিন দেখচেন, ও কি-রকম লোক বলতে পারেন? ওকে গণেশপুরের নতুন গোমস্তা বাহাল করেচি, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় কিনা—আপনার কি মনে হয়?

বিনোদ এক সপ্তাহের অধিক কাজ করিতেছে, যথাসাধ্য ভালো কাজই করিতেছে, কোন গোলযোগ ঘটায় নাই, সহসা হন্তদন্ত হইয়া তাঁহার চরিত্রের খোঁজতল্লাস করিবার এখনই কি প্রয়োজন হইল অনুরাধা ভাবিয়া পাইল না; মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, বিনোদদা কি কিছু করেছেন?

এখনো কিছু করেনি, কিন্তু সতর্ক হওয়া ত প্রয়োজন।

তাঁকে ভালো লোক বলেই ত জানি।

সত্যি জানেন, না নিন্দে করবেন না বলেই ভালো বলচেন?

আমার ভাল-মন্দ বলার কি কিছু দাম আছে?

আছে বৈ কি। সে যে আপনাকেই প্রামাণ্য সাক্ষী মেনে বসেছে।

অনুরাধা একটু ভাবিয়া বলিল, উনি ভালো লোকই বটে। শুধু একটু চোখ রাখবেন। নিজের অবহেলায় ভালো লোকও মন্দ হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়।

বিজয় কহিল, সত্যিই তাই। কারণ, অপরাধের হেতু খুঁজতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই অবাক হতে হয়।

ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তোর ভাগ্য ভালো যে হঠাৎ এক মাসীমা পেয়ে গেছিস, নইলে এই বন-বাদাড়ের দেশে অর্ধেক দিন না খেয়ে কাটাতে হ'তো।

অনুরাধা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি এখানে খাবার কষ্ট হচ্চে?

বিজয়া হাসিয়া বলিল, না, এমনিই বললুম। চিরকাল বিদেশে বিদেশে কাটিয়েছি, খাবার কষ্ট বড় গ্রাহ্য করিনে। বলিয়া চলিয়া গেল। অনুরাধা জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল তাহার স্নান পর্যন্ত এখনো হয় নাই।

চার

এ বাড়িতে আসিয়া একটা পুরাতন আরাম-কেদারা যোগাড় হইয়াছিল, বিকালের দিকে তাহারি দুই হাতলে পা ছড়াইয়া দিয়া বিজয় চোখ বুঝিয়া চুরুট টানিতেছিল, কানে গেল—বাবুমশাই? চোখ মেলিয়া দেখিল অনতিদূরে দাঁড়াইয়া এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহাকে সসম্মানে সম্বোধন করিতেছে। বিজয় উঠিয়া বসিল। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের উপরে গিয়াছে, কিন্তু দিব্য গোলগাল বেঁটেখাটো শক্ত-সমর্থ দেহ। গোঁফ পাকিয়া সাদা হইয়াছে, কিন্তু মাথায় প্রশস্ত টাকের আশেপাশের চুলগুলি ভ্রমর-কৃষ্ণ। সম্মুখের গোটা-কয়েক ছাড়া দাঁতগুলি প্রায় সমস্তই বিদ্যমান। গায়ে তসরের কোট, গরদের চাদর, পায়ে চীনা-বাড়ির বার্নিশ-করা জুতা, ঘড়ির সোনার চেন হইতে সোনা বাঁধানো বাঘের নখ ঝুলিতেছে। পল্লীঅঞ্চলে ভদ্রলোকটিকে অবস্থাপন্ন বলিয়াই মনে হয়। পাশে একটা ভাঙ্গা টুলের উপর বিজয়ের চুরুটের সাজ-সরঞ্জাম থাকিত, সরাইয়া লইয়া তাঁহাকে বসিতে দিল।

ভদ্রলোক বসিয়া বলিলেন, নমস্কার বাবু।

বিজয় কহিল, নমস্কার।

আগন্তুক বলিলেন, আপনারা গ্রামের জমিদার, মহাশয়ের পিতাঠাকুর হচ্ছেন কৃতী ব্যক্তি—লক্ষপতি। নাম করলে সুপ্রভাত হয়—আপনি তারই সুসন্তান। স্ত্রীলোকটিকে দয়া না করলে সে যে ভেসে যায়।

কে স্ত্রীলোক? কত টাকা বাকী?

ভদ্রলোক বলিলেন, টাকার ব্যাপার নয়। স্ত্রীলোকটি হচ্চেন ঈশ্বর অমর চাটুয্যের কন্যা—প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি—গগন চাটুয্যের বৈমাত্র ভগিনী। এ তার পৈতৃক গৃহ। সে থাকবে না চলে যাবে,—তা ব্যবস্থাও হয়েছে—কিন্তু আপনি যে তারে ঘাড়ে ধরে তাড়িয়ে দিচ্চেন, এ কি মশায়ের কর্তব্য?

এই অশিক্ষিত বৃদ্ধের প্রতি ক্রোধ করা চলে না বিজয় মনে মনে বুঝিল, কিন্তু কথা বলার ধরনে জ্বলিয়া গেল। কহিল, আমার কর্তব্য আমি বুঝব, কিন্তু আপনি কে যে তাঁর হয়ে ওকালতি করতে এসেছেন?

বৃদ্ধ বলিলেন, আমার নাম ত্রিলোচন গাঙ্গুলি, পাশের গ্রাম মসজিদপুরে বাড়ি—সবাই চেনে। আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে আমার কাছে গিয়ে হাত পাততে হয় না এমন লোক এদিকে কম। বিশ্বাস না হয় বিনোদ ঘোষকে জিজ্ঞেসা করবেন।

বিজয় কহিল, আমার হাত পাতবার দরকার হলে মশায়ের খোঁজ নেব, কিন্তু যাঁর ওকালতি করতে এসেছেন তাঁর আপনি কি জানতে পারি কি?

ভদ্রলোক রসিকতার ছলে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, কুটুম্ব। বোশেখের এই ক'টা দিন বাদে আমি ওঁকে বিবাহ করব।

বিজয় চকিত হইয়া কহিল, আপনি বিবাহ করবেন অনুরাধাকে?

আজ্ঞে হাঁ। আমার স্থির সঙ্কল্প। জ্যৈষ্ঠ ছাড়া আর দিন নেই, নইলে এই মাসেই শুভকর্ম সমাধা হয়ে যেত, থাকতে দেবার কথা আপনাকে আমার বলতেও হ'তো না।

বিজয় কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া প্রশ্ন করিল, বিয়ের ঘটকালি করলে কে? গগন চাটুয্যে?

বৃদ্ধ রোষ-কষায়িত চক্ষে কহিলেন, সে ত ফেরারী আসামী মশাই—প্রজাদের সর্বনাশ করে চম্পট দিয়েচে। এতদিন সেই ত বাধা দিচ্ছিল, নইলে অঘ্রানেই বিবাহ হয়ে যেত। বলে, স্বভাব-কুলীন, আমরা কৃষ্ণের সন্তান—বংশজের ঘরে বোন দেব না। এই ছিল তার বুলি। এখন সে গুমর রইল কোথায়? বংশজের ঘরে যেচে আসতে হ'লো যে! এখনকার দিনে কুল কে খোঁজে মশাই? টাকাই কুল, টাকাই মান, টাকাই সব,—বলুন ঠিক কিনা?

বিজয় বলিল, হাঁ ঠিক। অনুরাধা স্বীকার করেছেন?

ভদ্রলোক সদম্ভে জানুতে চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, স্বীকার? বলচেন কি মশাই, যাচা-যাচি! শহর থেকে এসে আপনি একটা তাড়া লাগাতেই দু'চোখে অন্ধকার–যাই মা তারা দাঁড়াই কোথা! নইলে আমার ত মতলব ঘুরে গিয়েছিল। ছেলেদের অমত, বৌমাদের অমত, মেয়ে-জামাইরা সব বেঁকে দাঁড়িয়েছিল,–আমিও ভেবেছিলুম দূর হোক গে, দু সংসার তো হ'লো, আর না। কিন্তু লোক দিয়ে নিজে ডেকে পাঠিয়ে রাধা কেঁদে বললে, গাঙ্গুলি মশাই, পায়ে স্থান দাও। তোমার উঠন ঝাঁট দিয়ে খাব আমার সেও ভালো। কি করি, স্বীকার করলুম।

বিজয় নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, বিবাহ এ-বাড়িতেই হবে। দেখতে একটু খারাপ দেখাবে, নইলে আমার বাড়িতেই হতে পারত। গগন চাটুয্যের কে এক পিসী আছে, সে-ই কন্যা সম্প্রদান করবে। এখন কেবল মশাই রাজী হলেই হয়।

বিজয় মুখ তুলিয়া বলিল, রাজী হয়ে আমাকে কি করতে হবে বলুন? তাড়া দেব না–এই ত? বেশ, তাই হবে। এখন আপনি আসুন, নমস্কার।

নমস্কার মশাই, নমস্কার। হবেই ত, হবেই ত। আপনার ঠাকুর হলেন লক্ষপতি! প্রাতঃস্মরণীয় লোক, নাম করলে সুপ্রভাত হয়।

তা হয়, আপনি এখন আসুন।

আসি মশাই আসি–নমস্কার। বলিয়া ত্রিলোচন প্রস্থান করিলেন।

লোকটি চলিয়া গেলে বিজয় চুপ করিয়া বসিয়া নিজেকে বুঝাইতেছিল যে, তাহার মাথাব্যথা করিবার কি আছে? বস্তুতঃ, এ-ছাড়া মেয়েটিরই বা উপায় কি? ব্যাপারটা অভাবিতপূর্বও নয়, সংসারে ঘটে না তাও নয়, তবে তাহার দুশ্চিন্তা কিসের? হঠাৎ বিনোদ ঘোষের কথা মনে পড়িল, সেদিন সে বলিতেছিল, অনুরাধা দাদার সঙ্গে এই বলিয়া ঝগড়া করিয়াছে যে কুলের গৌরব লইয়া সে কি করিবে, সহজে দুটা খাইতে পরিতে যদি পায় সেই যথেষ্ট।

প্রতিবাদে গগন রাগ করিয়া বলিয়াছিল, তুই কি বাপ-পিতাম'র নাম ডোবাতে চাস? অনুরাধা জবাব দিয়াছিল, তুমি তাঁদের বংশধর, নাম বজায় রাখতে পার রেখো, আমি পারব না।

এ কথার বেদনা বিজয় বুঝিল না, নিজেও সে যে কৌলীন্য-সম্মান এতটুকু বিশ্বাস করে তাও না, কিন্তু তবুও তাহার সহানুভূতি গিয়া পড়িল গগনের 'পরে এবং অনুরাধার তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তর যতই সে মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল ততই তাহাকে লজ্জাহীন, লোভী ও হীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

এদিকে উঠানে ক্রমশঃ লোক জমিতেছে, এইবার তাহাদিগকে লইয়া কাজ শুরু করিতে হইবে, কিন্তু আজ তাহার কিছুই ভাল লাগিল না। দারোয়ানকে দিয়া তাহাদের বিদায় করিয়া দিল এবং একাকী বসিয়া থাকিতে না পারিয়া কি ভাবিয়া সে একেবারে বাটীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। রান্নাঘরের সম্মুখের খোলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া অনুরাধা শুইয়া, তাহার দুই পাশে দুই ছেলে কুমার ও সন্তোষ,–মহাভারতের গল্প চলিতেছে। রাত্রের রান্নাটা সে বেলাবেলি সারিয়া লইয়া নিত্যই এমনি ছেলেদের লইয়া সন্ধ্যার পরে গল্প করে, তারপর কুমারকে খাওয়াইয়া বাহিরে তাহার পিতার কাছে পাঠাইয়া দেয়। জ্যোৎস্না রাত্রি, ঘন-পল্লব আমগাছের পাতার ফাঁক দিয়া আসিয়া টুকরা চাঁদের আলো স্থানে স্থানে তাহাদের গায়ের 'পরে, মুখের 'পরে পড়িয়াছে।

গাছের ছায়ায় একটা লোককে এদিকে আসিতে দেখিয়া অনুরাধা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

আমি বিজয়।

তিনজনেই শশব্যস্ত উঠিয়া বসিল। সন্তোষ ছোটবাবুকে অত্যন্ত ভয় করে, প্রথম দিনের স্মৃতি সে ভুলে নাই, উসখুস করিয়া উঠিয়া গেল, কুমারও বন্ধুর অনুসরণ করিল।

বিজয় বলিল, ত্রিলোচন গাঙ্গুলিকে আপনি চেনেন? আজ তিনি আমার কাছে এসেছিলেন।

অনুরাধা বিস্মিত হইল, আপনার কাছে? কিন্তু আপনি ত তাঁর খাতক ন'ন।

না। কিন্তু হলে হয়ত আপনার সুবিধে হ'তো, আমার একদিনের অত্যাচার আপনি আর একদিন শোধ দিতে পারতেন।

অনুরাধা চুপ করিয়া রহিল।

বিজয় বলিল, তিনি জানিয়ে গেলেন, আপনার সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হয়েছে। এ কি সত্য?

হাঁ।

আপনি নিজে উপযাচক হয়ে তাকে রাজী করিয়েছেন?

হাঁ তাই।

তাই যদি হয়ে থাকে এ অত্যন্ত লজ্জার কথা। শুধু আপনার নয়, আমারও।

আপনার লজ্জা কিসের?

সেই কথা জানাতেই আমি এসেছি। ত্রিলোচন বলে গেল শুধু আমার তাড়াতেই বিভ্রান্ত হয়ে নাকি আপনি এ প্রস্তাব করেছেন। বলেছেন আপনার দাঁড়বার স্থান নেই এবং বহু সাধ্যসাধনায় তাকে সম্মত করিয়েছেন, নইলে এ বয়সে বিবাহের ইচ্ছে সে ত্যাগ করেছিল। শুধু আপনার কান্নাকাটিতে দয়া করে ত্রিলোচন রাজী হয়েছে।

হাঁ, এ-সবই সত্যি।

বিজয় কহিল, আমার তাড়া দেওয়া আমি প্রত্যাহার করচি এবং নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করচি।

অনুরাধা চুপ করিয়া রহিল।

বিজয় বলিল, এবার নিজের তরফ থেকে আপনি প্রস্তাব প্রত্যাহার করুন।

না, সে হয় না। আমি কথা দিয়েছি–সবাই শুনেছে–লোকে তাঁকে উপহাস করবে।

এতে করবে না? বরঞ্চ ঢের বেশী করবে। তার উপযুক্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিবাদ বাধবে, তাদের সংসারে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, আপনার নিজের অশান্তির সীমা থাকবে না, এ-সব কথা কি ভেবে দেখেন নি?

অনুরাধা মৃদুকণ্ঠে বলিল, দেখেচি। আমার বিশ্বাস এ-সব কিছুই হবে না।

শুনিয়া বিজয় অবাক হইয়া গেল, কহিল, সে বৃদ্ধ ক'টা দিন বাঁচবে আশা করেন?

অনুরাধা বলিল, স্বামীর পরমায়ু সংসারে সকল স্ত্রীই বেশী আশা করে। এমনও হতে পারে হাতের নোয়া নিয়ে আমি আগে চলে যাব।

বিজয় এ কথার উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ এমনি নীরবে কাটিলে অনুরাধা বিনীত স্বরে কহিল, আপনি আমাকে চলে যেতে হুকুম করেছেন সত্যি, কিন্তু কোনদিন তার উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। দয়ার যোগ্য নই, তবু যথেষ্ট দয়া করেছেন, মনে মনে আমি যে কত কৃতজ্ঞ তা জানাতে পারিনে।

বিজয়ের কাছে উত্তর না পাইয়া সে বলিতে লাগিল, ভগবান জানেন আপনার বিরুদ্ধে কারো কাছে আমি একটা কথাও বলিনি। বললে আমার অন্যায় হ'তো, আমার মিছে কথা হ'তো। গাঙ্গুলিমশাই যদি কিছু বলে থাকেন সে তাঁর নিজের কথা আমার নয়। তবু তাঁর হয়ে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের কবে বিয়ে, তেরই জ্যৈষ্ঠ? তা হলে প্রায় মাসখানেক বাকী রইল—না?

হাঁ তাই।

এর আর পরিবর্তন নেই বোধ করি?

বোধ হয় নেই। অন্ততঃ, সেই ভরসাই তিনি দিয়ে গেছেন।

বিজয় বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, তা হলে আর কিছু আমার বলবার নেই, কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ জীবনটা একবার ভেবে দেখলেন না, আমার এই বড় পরিতাপ।

অনুরাধা বলিল, একবার নয়, একশো-বার ভেবে দেখেছি ছোটবাবু। এই আমার রাত্রি-দিনের চিন্তা। আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার সত্যিই ভাষা খুঁজে পাইনে, কিন্তু আপনি নিজে একবার আমার সব কথা ভেবে দেখুন দিকি। অর্থ নেই, রূপ নেই, গৃহ নেই, অভিভাবকহীন একাকী পল্লীগ্রামের অনাচার অত্যাচার থেকে কোথাও গিয়ে দাঁড়াবার স্থান নেই—বয়স হলো তেইশ-চব্বিশ—ইনি ছাড়া আমাকে কে বিয়ে করতে চাইবে বলুন ত? তখন অন্নের জন্যে কার কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াব? শুনে আপনারই বা কি মনে হবে?

এ সবই সত্য, প্রতিবাদে কিছুই বলিবার নাই। মিনিট দুই-তিন নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া বিজয় গভীর অনুতাপের সহিত বলিল, এ সময়ে আপনার কি আমি কোন উপকারই করতে পারিনে? পারলে খুশী হবো।

অনুরাধা কহিল, আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন যা কেউ করত না। আপনার আশ্রয়ে আমি নির্ভয়ে আছি,—ছেলে দুটি আমার চন্দ্র-সূয্যি—এই আমার ঢের। আপনার কাছে প্রার্থনা, শুধু মনে মনে আর আমাকে আমার দাদার দোষের ভাগী করে রাখবেন না, আমি জেনে কোন অপরাধ করিনি।

সে আমি জানতে পেরেছি, আপনাকে বলতে হবে না। এই বলিয়া বিজয় ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

পাঁচ

কলিকাতা হইতে কিছু তরি-তরকারি ও ফলমূল মিষ্টান্ন আসিয়াছিল; বিজয় চাকরকে দিয়া ঝুড়িটা আনিয়া রান্নাঘরের সুমুখে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, ঘরে আছেন নিশ্চয়ই—

ভিতরে হইতে মৃদুকণ্ঠে সাড়া আসিল, আছি।

বিজয় বলিল, মুশকিল হয়েছে আপনাকে ডাকার। আমাদের সমাজে হলে মিস চ্যাটার্জি কিংবা মিস অনুরাধা বলে অনয়াসে ডাকা চলত, কিন্তু এখানে তা অচল। আপনার ছেলে দুটোর কেউ উপস্থিত থাকলে তোদের মাসীকে ডেকে দে' বলে কাজ চালাতুম, কিন্তু তারাও ফেরার। কি বলে ডাকি বলুন ত?

অনুরাধা দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, আপনি মনিব, আমাকে রাধা বলে ডাকবেন।

বিজয় বলিল, ডাকতে আপত্তি নেই, কিন্তু মনিবানা স্বত্বের জোরে নয়। দায় ছিল গগন চাটুয্যের, কিন্তু সে দিলে গা-ঢাকা; মনিব বলে আপনি কেন মানতে যাবেন? আপনার গরজ কিসের?

ভিতর হইতে শুধু শোনা গেল, ও-কথা বলবেন না, আপনি মনিব বৈ কি।

বিজয় বলিল, সে দাবী করিনে, কিন্তু বয়সের দাবী করি। আমি অনেক বড়, নাম ধরে ডাকলে যেন রাগ করবেন না।

না।

বিজয় এটা দেখিয়াছে যে, ঘনিষ্ঠতা করার আগ্রহ তাহার দিক দিয়া যত প্রবলই হোক, ও-পক্ষ হইতে লেশমাত্র নাই। সে কিছুতে সুমুখে আসে না এবং সংক্ষেপে ও সম্ভ্রমের সঙ্গে বরাবরই আড়াল হইতে উত্তর দেয়।

বিজয় বলিল, বাড়ি থেকে কিছু তরি-তরকারি, কিছু ফলমূল, মিষ্টি এসে পৌঁছেচে। ঝুড়িটা তুলে রাখুন, ছেলেদের দেবেন।

থাক। দরকার-মত রেখে আপনার বাইরে পাঠিয়ে দেব।

না, সে করবেন না। আমার বামুনটা রাঁধতেও জানে না, দুপুর থেকে দেখচি চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। কি জানি আপনাদের দেশের ম্যালেরিয়া তাকে ধরলে কিনা। তা হলে ভোগাবে।

কিন্তু ম্যালেরিয়া ত আমাদের দেশে নেই। বামুন না উঠলে এ-বেলা আপনার রাঁধবে কে?

বিজয় বলিল, এ-বেলার কথা ছেড়ে দিন, ভেবে দেখব কাল সকালে। আর কুকারটা ত সঙ্গে আছেই, শেষ পর্যন্ত চাকরকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে পারব।

কিন্তু তাতে কষ্ট হবে ত?

না। নিজের অভ্যাস আছে, শুধু কষ্ট হতে পারত ছেলের খাবার কষ্ট চোখে দেখলে। কিন্তু সে ভার ত আপনি নিয়েছেন কি রাঁধচেন এ-বেলা? ঝুড়িটা খুলে দেখুন না যদি কাজে লাগে।

কাজে লাগবে বৈ কি। কিন্তু এ-বেলা আমার রান্না নেই।

নেই? কেন?

কুমারের একটু গা-গরম হয়েছে, রাঁধলে সে খাবার উপদ্রব করবে। ও-বেলার যা আছে তাতে সন্তোষের চলে যাবে।

গা-গরম হয়েছে তার? কোথায় আছে সে?

আছে আমার বিছানায় শুয়ে—সন্তোষের সঙ্গে গল্প করচে। আজ বলছিল বাইরে যাবে না, আমার কাছে শোবে।

বিজয় বলিল, তা শুক, কিন্তু বেশী আদর পেলে মাসীকে ছেড়ে ও-বাড়ি যেতে চাইবে না। তখন ওকে নিয়ে বিভ্রাট বাধবে।

না, বাধবে না। কুমার অবাধ্য ছেলে নয়।

বিজয় বলিল, কি হলে অবাধ্য হয় সে আপনি জানেন, কিন্তু শুনতে পাই আপনার 'পরে ও কম উৎপাত করে না।

অনুরাধা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ও উপদ্রব যদি করে আমার ওপরেই করে, আর কারো ওপরে না।

বিজয় বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু মাসীই না হয় সহ্য করলে, কিন্তু জ্যাঠাইমা সইবে না। আর বিমাতা যদি আসেন, তিনি এতটুকু অত্যাচারও বরদাস্ত করবেন না। অভ্যাস বিগড়ালে ওর বিপদ ঘটবে যে।

ছেলের বিপদ ঘটবে এমন বিমাতা ঘরে আনবেন কেন? না-ই বা আনলেন।

বিজয় বলিল, আনতে হয় না, ছেলের কপাল ভাঙ্গলে বিমাতা আপনি এসে ঘরে ঢোকেন। তখন বিপদ ঠেকাতে মাসীর শরণাপন্ন হতে হয়, অবশ্য তিনি যদি রাজী হন।

অনুরাধা বলিল, যার মা নেই মাসী তাকে ফেলতে পারে না, যত দুঃখে হোক মানুষ করে তোলেই।

কথাটা শুনে রাখলুম, বলিয়া বিজয় চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া আসিয়া কহিল, যদি অবিনয় মাপ করেন একটা কথা জিজ্ঞেসা করি।

করুন।

কুমারের চিন্তা পরে করা যাবে, কারণ তার বাপ বেঁচে আছে। তাকে যত পাষণ্ড লোকে ভাবে সে তা নয়। কিন্তু সন্তোষ? তার ত বাপ-মা দুই-ই গেছে, নতুন মেসো ত্রিলোচনের ঘরে যদি তার ঠাঁই না হয়, কি করবেন তাকে নিয়ে? ভেবেচেন সে কথা?

অনুরাধা বলিল, মাসীর ঠাঁই হবে, বোনপোর হবে না?

হওয়াই উচিত, কিন্তু যেটুকু তাঁর দেখতে পেলুম তাতে ভরসা বড় হয় না।

এ কথার জবাব অনুরাধা তৎক্ষণাৎ দিতে পারিল না, ভাবিতে একটু সময় লাগিল, তারপরে শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, তখন গাছতলায় দু'জনের স্থান হবে। সে কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

বিজয় বলিল, মাসীর যোগ্য কথা অস্বীকার করিনে, কিন্তু সে সম্ভব নয়। তখন আমার কাছে তাকে পাঠিয়ে দেবেন; কুমারের বন্ধু ও, সে যদি মানুষ হয় সন্তোষও হবে।

ভিতর হইতে আর কোন জবাব আসিল না, বিজয় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই-তিন পরে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সন্তোষ বলিল, মাসীমা আপনাকে খেতে ডাকচেন।

আমাকে?

হাঁ, বলিয়াই সে প্রস্থান করিল।

অনুরাধার রান্নাঘরে খাবার ঠাঁই করা। বিজয় আসনে বসিয়া বলিল, রাত্রিটা অনায়াসে কেটে যেত, কেন আবার কষ্ট করলেন?

অনুরাধা অনতিদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, চুপ করিয়া রহিল।

ভোজ্যবস্তুর বাহুল্য নাই, কিন্তু যত্নের পরিচয় প্রত্যেকটি জিনিসে। কি পরিপাটি করিয়াই না খাবারগুলি সাজানো। আহারে বসিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, কুমার কি খেলে?

সাগু খেয়ে সে ঘুমিয়েছে।

ঝগড়া করেনি আজ?

অনুরাধা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আমার কাছে শোবে বলে আজ ও ভারী শান্ত। মোটে ঝগড়া করেনি।

বিজয় বলিল, ওকে নিয়ে আপনার ঝঞ্ঝাট বেড়েচে কিন্তু আমার দোষে নয়। ও নিজেই কি করে যে আপনার সংসারের মধ্যে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল তাই আমি ভাবি।

আমিও ঠিক তাই ভাবি।

মনে হয়, ও বাড়ি চলে গেলে আপনার কষ্ট হবে।

অনুরাধা চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল, নিয়ে যাবার আগে কিন্তু আপনাকে একটি কথা দিয়ে যেতে হবে। আপনাকে চোখ রাখতে হবে ও যেন কষ্ট না পায়।

কিন্তু আমি ত থাকি বাইরে নানা কাজে ব্যস্ত, কথা রাখতে পারব বলে ভরসা হয় না।

তা হলে আমার কাছে ওকে দিয়ে যেতে হবে।

আপনি ভুলে যাচ্চেন যে সে আরও অসম্ভব। এই বলিয়া বিজয় হাসিয়া খাওয়ায় মন দিল। একসময়ে বলিল, আমার বৌদিদিদের আসার কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা বোধ করি আর এলেন না।

কেন?

যে খেয়ালে বলেছিলেন সম্ভবতঃ সেটা কেটে গেছে। শহরের লোক পাড়াগাঁয়ে সহজে পা বাড়াতে চান না। একপ্রকার ভালই হয়েছে। একা আমিই ত আপনার যথেষ্ট অসুবিধে ঘটিয়েছি, তাঁরা এলে সেটা বাড়ত।

অনুরাধা এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এ বলা আপনার অন্যায়। বাড়ি আমার নয়, আপনাদের। তবু আমিই সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে থাকব, তাঁরা এলে রাগ করব, এর চেয়ে অন্যায় হতেই পারে না। আমার সম্বন্ধে এমন কথা ভাবা আমার প্রতি সত্যিই আপনার অবিচার। যত দয়া আমাকে করেছেন আমার দিক থেকে এই কি তার প্রতিদান?

এত কথা এমন করিয়া সে কখনো বলে নাই। জবাব শুনিয়া বিজয় আশ্চর্য হইয়া গেল,—যতটা অশিক্ষিত এই পাড়াগাঁয়ের মেয়েটিকে সে ভাবিয়াছিল তাহা নয়। একটুখানি স্থির থাকিয়া আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিল, সত্যই এ কথা বলা আমার উচিত হয়নি। যাদের সম্বন্ধে এ কথা খাটে আপনি তাদের চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু দু-তিনদিন পরেই আমি বাড়ি চলে যাব, এখানে এসে প্রথমে আপনার প্রতি নানা দুর্ব্যবহার করেচি, কিন্তু সে না-জানার জন্যে। অথচ, সংসারে এমনিই হয়, এমনিই ঘটে। তবু, যাবার আগে আমি গভীর লজ্জার সঙ্গে আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করি।

অনুরাধা মৃদুকণ্ঠে বলিল, ক্ষমা আপনি পাবেন না।

পাব না? কেন?

এসে পর্যন্ত যে অত্যাচার করেছেন তার ক্ষমা নেই, এই বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

প্রদীপের স্বল্প আলোকে তাহার হাসিমুখ বিজয়ের চোখে পড়িল এবং মুহূর্তকালের এক অজানা বিস্ময়ে সমস্ত অন্তরটা দুলিয়া উঠিয়াই আবার স্থির হইল। ক্ষণকাল নির্বাক থাকিয়া বলিল, সেই ভালো, ক্ষমায় কাজ নেই। অপরাধী বলেই যেন চিরকাল মনে পড়ে।

উভয়েই নীরব। মিনিট দুই-তিন ঘরটা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

নিঃশব্দতা ভঙ্গ করিল অনুরাধা। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আবার কবে আসবেন?

মাঝে মাঝে আসতেই হবে জানি, যদিচ দেখা আর হবে না।

ও পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ আসিল না, বুঝা গেল ইহা সত্য।

খাওয়া শেষ হইলে বিজয় বাহিরে যাইবার সময়ে অনুরাধা বলিল, ঝুড়িটায় অনেক রকম তরকারি আছে, কিন্তু বাইরে আর পাঠালুম না। কাল সকালেও আপনি এখানেই খাবেন।

তথাস্তু। কিন্তু বুঝেছেন বোধ করি সাধারণের চেয়ে ক্ষিদেটা আমার বেশী। নইলে প্রস্তাব করতুম শুধু সকালে নয়, নেমন্তন্নর মেয়াদটা বাড়িয়ে দিন যে-কটা দিন থাকি, আপনার হাতে খেয়েই যেন বাড়ি চলে যেতে পারি।

উত্তর আসিল, সে আমার সৌভাগ্য।

পরদিন প্রভাতেই বহুবিধ আহার্য-দ্রব্য অনুরাধার রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া পৌঁছিল। সে আপত্তি করিল না, তুলিয়া রাখিল।

ইহার পরে তিন দিনের স্থলে পাঁচ দিন কাটিল। কুমার সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। এই কয়দিন বিজয় ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিল যে, আতিথ্যের ত্রুটি কোনদিকে নাই, কিন্তু পরিচয়ের দূরত্ব তেমনি অবিচলিত রহিল, কোন ছলেই তিলার্ধ সন্নিকটবর্তী হইল না। বারান্দায় খাবার জায়গা করিয়া দিয়া অনুরাধা ঘরের মধ্যে হইতে সাজাইয়া গুছাইয়া দেয়, পরিবেশন করে সন্তোষ। কুমার আসিয়া বলে, বাবা, মাসীমা বললেন মাছের তরকারিটা অতখানি পড়ে থাকলে চলবে না, আর একটু খেতে হবে। বিজয় বলে, তোমার মাসীমাকে বল গে বাবাকে রাক্ষস ভাবা তাঁর অন্যায়। কুমার ফিরিয়া আসিয়া বলে, মাছের তরকারি থাক, ও বোধ হয় ভালো হয়নি, কিন্তু কালকের মত বাটিতে দুধ পড়ে থাকলে তিনি দুঃখ করবেন। বিজয় শুনাইয়া বলিল, তোমার মাসী যেন কাল থেকে গামলার বদলে বাটিতে করেই দুধ দেন, তা হলে পড়ে থাকবে না।

ছয়

এমনি করিয়া এই পাঁচটা দিন কাটিল। মেয়েদের যত্নের ছবিটা বিজয়ের মনে ছিল চিরদিনই অস্পষ্ট, মাকে সে ছেলেবেলা হইতে অসুস্থ ও অপটু দেখিয়াছে, গৃহিণীপনার কোন কর্তব্যই তিনি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই—নিজের স্ত্রীও ছিল মাত্র বছর-দুই জীবিত—তখন তাহার পাঠ্যাবস্থা। ইহার পরে হইতে দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল সুদূর প্রবাসে। সেদিকের অভিজ্ঞতার ভালো-মন্দ অনেক স্মৃতি মাঝে মাঝে মনে পড়ে, কিন্তু সমস্তই যেন অবাস্তব বইয়ে পড়া কল্পিত কাহিনী। জীবনের সত্য প্রয়োজনে একেবারে সম্বন্ধবিহীন।

আর আছে তাহার দাদার স্ত্রী প্রভাময়ী। যে পরিবারে বৌদিদিদের বিচার চলে, ভালো-মন্দর আলোচনা হয়, সে পরিবার তাহাদের নয়। মাকে অনেকদিন কাঁদিতে দেখিয়াছে, বাবা বিরক্ত ও বিমর্ষ হইয়াছেন, কিন্তু এ-সকল সে নিজেই অসঙ্গত ও অনধিকার-চর্চা মনে করিয়াছে। জ্যাঠাইমা দেবর-পুত্রের খোঁজ না রাখিলে, বধূ শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা না করিলে যে প্রচণ্ড অপরাধ হয়, এ ধারণা তাহার নয়। তাহার নিজের স্ত্রীকেও অনুরূপ আচরণ করিতে দেখিলে সে যে মর্মাহত হইত তাহাও নয়। কিন্তু তাহার এতকালের ধারণাকে এই শেষের পাঁচটা দিন যেন ধাক্কা দিয়া নড়বড়ে করিয়া দিল। আজ সন্ধ্যার ট্রেনে তাহার যাত্রা করিবার সময়, চাকর জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত করিতেছে, আর ঘণ্টা-কয়েক মাত্র দেরি, সন্তোষ আসিয়া আড়াল হইতে বলিল, মাসীমা খেতে ডাকচেন।

এমন সময়ে?

হাঁ, বলিয়াই সে সরিয়া পড়িল।

বিজয় ভিতরে আসিয়া দেখিল যথারীতি বারান্দায় আসন পাতিয়া ঠাঁই করা হইয়াছে; মাসীর গলা ধরিয়া কুমার ঝুলিতেছিল, তাহার হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া অনুরাধা রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

আসনে বসিয়া বিজয় কহিল, এ কি ব্যাপার!

ভিতর হইতে অনুরাধা বলিল, দুটি খিচুড়ি রেঁধে রেখেচি, খেতে বসুন।

জবাব দিতে গিয়া আজ বিজয়কে গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইতে হইল, কহিল, অসময়ে কেন আবার কষ্ট করতে গেলেন? আর যদি করলেন খান-কতক লুচি ভেজে দিলেই হ'তো।

অনুরাধা কহিল, লুচি ত আপনি খান না। বাড়ি পৌঁছতে রাত্রি দুটো-তিনটে বাজবে, না খেয়ে উপোস করে গেলেই কি কষ্ট আমার কম হবে? কেবলি মনে পড়বে ছেলেটা না খেয়ে গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বিজয় নীরবে কিছুক্ষণ আহার করিয়া বলিল, বিনোদকে বলে গেলুম সে যেন আপনাকে দেখে। যে-ক'টা দিন এ-বাড়িতে আছেন যেন অসুবিধে কিছু না হয়।

সে আবার কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, আর একটা কথা জানিয়ে যাই। যদি দেখা হয় গগনকে বলবেন, আমি তাকে মাপ করেচি, কিন্তু এ গাঁয়ে যেন আর না সে আসে। এলে ক্ষমা করব না।

কখনো দেখা হলে তাঁকে জানাব, এই বলিয়া অনুরাধা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, মুশকিল হয়েছে কুমারকে নিয়ে। আজ সে কিছুতেই যেতে চাচ্চে না। অথচ কেন যে চাচ্চে না তাও বলে না।

বিজয় কহিল, বলতে চায় না নিজেই জানে না বলে। অথচ, মনে মনে বোঝে সেখানে গেলে ওর কষ্ট হবে।

কষ্ট হবে কেন?

সে বাড়ির নিয়ম ওই। কিন্তু হ'লোই বা কষ্ট, এর মধ্যে দিয়েই ত ও এত বড় হ'লো।

তা হলে গিয়ে কাজ নেই। থাক আমার কাছে।

বিজয় সহাস্যে কহিল, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বড়জোর এই মাসটা, তার বেশী ত থাকতে পারবে না—তাতে লাভ কি?

উভয়েই মৌন হইয়া রহিল।

অনুরাধা বলিল, ওর বিমাতা যিনি আসবেন শুনেচি তিনি শিক্ষিতা মেয়ে।

হ্যাঁ, তিনি বি. এ. পাস করেছেন।

কিন্তু, বি. এ. পাস ত ওর জ্যাঠাইমাও করেছেন।

নিশ্চয় করেছেন। কিন্তু বি. এ. পাসের কেতাবের মধ্যে দেওরপোকে যত্ন করার কথা লেখা নেই। সে পরীক্ষা তাঁকে দিতে হয়নি।

কিন্তু রুগ্ন শ্বশুর-শাশুড়ী ? সে কথাও কি কেতাবে লেখে না ?

না। এ প্রস্তাব আরও হাস্যকর।

হাস্যকর নয় এমন কি কিছু আছে ?

আছে। বিন্দুমাত্র অনুযোগ না করাই হচ্ছে আমাদের সমাজের সুভদ্র বিধি।

অনুরাধা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, এ বিধি আপনাদেরই থাক। কিন্তু যে বিধি সকলের সমান সে হচ্চে এই যে, ছেলের চেয়ে বি. এ. পাস বড় নয়। এমন মেয়েকে ঘরে আনা অনুচিত।

কিন্তু আনতে কাউকে ত হবেই। যে দলের আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছি সেখানে বি. এ. পাস নইলে মানও বাঁচে না, মনও বোঝে না। এবং বোধ হয় ঘরও চলে না। মা-বাপ-মরা বোনপোর জন্যে গাছতলা স্বীকার করে নিতে চায় এমন মেয়ে নিয়ে আমাদের বনবাস করা চলে, কিন্তু সমাজে বাস করা চলে না।

অনুরাধার কণ্ঠস্বর পলকের জন্য তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল—না, সে হবে না। একজন নির্দয় বিমাতার হাতে তুলে দিতে ওকে আপনি পারবেন না।

বিজয় কহিল, সে ভয় নেই। কারণ, তুলে দিলেও হাত থেকে আপনিই গড়িয়ে কুমার নীচে এসে পড়বে।কিন্তু তাই বলে তিনি নির্দয়ও নয়, এবং আমার ভাবী পত্নীর স্বপক্ষে আপনার কথার আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। মার্জিত রুচিসম্মত উদাস অবহেলায় তাঁদের নেতিয়ে-পড়া আত্মীয়তায় বর্বরতার লেশ নেই। ও দোষটা দেবেন না।

অনুরাধা হাসিয়া বলিল, প্রতিবাদ যত খুশি করুন, কিন্তু জিজ্ঞেসা করি, নেতিয়ে-পড়া আত্মীয়তার মানেটা হ'লো কি ?

বিজয় বলিল, ও আমাদের বড় সার্কেলের পারিবারিক বন্ধন। ওর কোড আলাদা, চেহারা স্বতন্ত্র। ওর শেকড় টানে না রস, পাতার রঙ সবুজ না হতেই ধরে হলুদের বর্ণ। আপনি পাড়াগাঁয়ে গৃহস্থঘরের মেয়ে, ইস্কুলে-কলেজে পড়ে পাস করেন নি, পার্টিতে পিকনিকে মেশেন নি, ওর নিগূঢ় অর্থ আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না, কেবল এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি কুমারের বিমাতা এসে তাকে বিষ খাওয়াবার আয়োজনও করবেন না, চাবুক-হাতে তাড়া করেও বেড়াবেন না। কারণ সে মার্জিত রুচিবিরুদ্ধ আচরণ। সুতরাং সেদিকে নির্ভয় হতে পারেন।

অনুরাধা বলিল, আমি তাঁর কথা ছেড়ে দিলুম, কিন্তু আপনি নিজে দেখেবন কথা দিন। এই আমার মিনতি।

বিজয় কহিল, কথা দিতেই ইচ্ছে করে, কিন্তু, আমার স্বভাবও আলাদা, অভ্যাসও আলাদা। আপনার অগ্রহ স্মরণ করে মাঝে মাঝে দেখবার চেষ্টা করব, কিন্তু যতটা আপনি চান তা পেরে উঠব মনে হয় না। কিন্তু আমার খাওয়া শেষ হ'লো এখন যাই। যাবার উদ্যোগ করি গে। বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল, কহিল, রইল কুমার আপনার কাছে, ওকে ছাড়বার দিন এলে দেবেন বিনোদকে দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে। প্রয়োজন হয় অসঙ্কোচে সন্তোষকেও সঙ্গে দেবেন। প্রথমে এসে যে ব্যবহার করেচি ঠিক সেই আমার প্রকৃতি নয়। এ ভরসা আর একবার দিয়ে চললুম—আমার বাড়িতে কুমারের চেয়ে বেশী অনাদর সন্তোষের ঘটবে না।

বাড়ির সম্মুখে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া, জিনিসপত্র বোঝাই দেওয়া হইয়াছে; বিজয় উঠিতে যাইতেছে, কুমার বলিল, বাবা, মাসীমা ডাকচেন একবার।

সদর দরজার পাশে দাঁড়াইয়া অনুরাধা কহিল, প্রণাম করব বলে ডেকে পাঠালুম, আবার কবে যে করতে পাবো জানিনে। এই বলিয়া গলায় আঁচল দিয়া দূর হইতে প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুমারকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, ঠাকুরমাকে ভাবতে বারণ করবেন। যে-ক'টা দিন ছেলেটা আমার কাছে রইল অযত্ন হবে না।

বিজয় হাসিয়া বলিল, বিশ্বাস করা কঠিন।

কঠিন কার কাছে ? আপনার কাছেও নাকি ? বলিয়া সেও হাসিতে গিয়া দু'জনের চোখাচোখি হইল। বিজয় স্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহার চোখের পাতা দুটি জলে ভিজা। মুখ নামাইয়া বলিল, কুমারকে নিয়ে গিয়ে কিন্তু কষ্ট দেবেন না যেন। আর বলতে পাব না বলেই বার বার করে বলে রাখচি। আপনাদের বাড়ির কথা মনে হলে ওকে পাঠাতে আমার ইচ্ছে হয় না।

না-ই বা পাঠালেন।

প্রত্যুত্তরে সে শুধু একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বিজয় বলিল, যাবার পূর্বে আপনার প্রতিশ্রুতির কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই। কথা দিয়েছেন কখনো কিছু প্রয়োজন হলে চিঠি লিখে আমাকে জানাবেন।

আমার মনে আছে। জানি, গাঙ্গুলিমশায়ের কাছে ভিক্ষুকের মতই আমাকে চাইতে হবে, মনের সমস্ত ধিক্কার বিসর্জন দিয়েই চাইতে হবে, কিন্তু আপনার কাছে তা নয়। যা চাইব স্বচ্ছন্দে চাইব।

কিন্তু মনে থাকে যেন, এই বলিয়া বিজয় যাইতে উদ্যত হইলে সে কহিল, তবে আপনিও একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। বলুন প্রয়োজন হলে আমাকেও জানাবেন ?

জানাবার মত আমার কি প্রয়োজন হবে অনুরাধা ?

তা কি করে জানব। আমার আর কিছু নেই, কিন্তু প্রয়োজন হলে প্রাণ দিয়ে সেবা করতেও ত পারব।

আপনাকে ওরা করতে দেবে কেন ?

আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।

সাত

কুমার আসে নাই শুনিয়া মা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন—সে কি কথা রে! যার সঙ্গে ঝগড়া তার কাছেই ছেলে রেখে এলি ?

বিজয় বলিল, যার সঙ্গে ঝগড়া সে গিয়ে পাতালে ঢুকেচে মা, তাকে খুঁজে বার করে সাধ্য কার ? তোমার নাতি রইল তার মাসীর কাছে। দিন-কয়েক পরেই আসবে।

হঠাৎ মাসী এল কোথা থেকে রে ?

বিজয় বলিল, ভগবানের তৈরী সংসারে হঠাৎ কে যে কোথা থেকে এসে পৌঁছায়, মা, কেউ বলতে পারে না। যে তোমার টাকাকড়ি নিয়ে ডুব মেরেছে এ সেই গগন চাটুয্যের ছোটবোন। বাড়ি থেকে একেই তাড়াব বলে লাঠিসোঁটা পিয়াদা-পাইক নিয়ে রণসজ্জায় যাত্রা করেছিলুম, কিন্তু তোমার আপনার নাতিই করলে গোল। এমনি তার আঁচল চেপে রইল যে দু'জনকে একসঙ্গে না তাড়ালে আর তাড়ানো চলল না।

মা ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার বুঝি তার খুব অনুগত হয়ে পড়েচে ? মেয়েটা খুব যত্নআত্তি করে বুঝি ? বাছা যত্ন ত কখনো পায় না। এই বলিয়া তিনি নিজের অস্বাস্থ্য স্মরণ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

বিজয় বলিল, আমি ছিলুম বাইরে, বাড়ির ভেতরে কে কাকে কি যত্ন করত চোখে দেখিনি, কিন্তু আসবার সময়ে কুমার মাসীকে ছেড়ে কিছুতে আসতে চাইলে না।

মার তথাপি সন্দেহ ঘুচিল না, বলিলেন, ওরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কত রকম জানে। সঙ্গে না এনে ভালো করিস নি বাবা।

বিজয় বলিল, তুমি নিজে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হয়ে পাড়াগাঁয়ের বিরুদ্ধে তোমার এই নালিশ! শেষকালে তোমার বিশ্বাস গিয়ে পড়ল বুঝি শহরের মেয়ের ওপর?

শহরের মেয়ে! তাঁদের চরণে কোটী কোটী নমস্কার!—এই বলিয়া দুই হাত এক করিয়া কপালে ঠেকাইলেন।

বিজয় হাসিয়া ফেলিল।

মা বলিলেন, হাসচিস কি রে! আমার দুঃখ কেবল আমিই জানি, আর জানেন তিনি। বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল, কহিলেন, আমরা যখনকার, সে পাড়াগাঁ কি আর আছে বাবা? দিন-কাল সব বদলে গেছে।

বিজয় বলিল, অনেক বদলেছে, কিন্তু যতদিন তোমরা বেঁচে আছ বোধ হয় তোমাদের পুণ্যেই এখনো কিছু বাকী আছে মা, একেবারে লোপ পায়নি। তারই একটুখানি এবারে দেখে এলুম। কিন্তু তোমাকে যে সে জিনিস দেখাবার জো নেই এই দুঃখটাই মনে রইল। এই বলিয়া সে অফিসে বাহির হইয়া গেল। অফিসের কাজের তাড়াতেই ব্যস্ত হইয়া তাহাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে।

বিকালে অফিস হইতে ফিরিয়া বিজয় ও মহলে বৌদিদির সঙ্গে দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখিল সেখানে বাধিয়াছে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। প্রসাধনের জিনিসপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, দাদা ইজিচেয়ারের হাতলে বসিয়া প্রবল-কণ্ঠে বলিতেছেন, কখখনো না। যেতে হয় একলা যাও। এমন কুটুম্বিতেয় আমি দাঁড়িয়ে—ইত্যাদি।

অকস্মাৎ বিজয়কে দেখিয়া প্রভা হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল,—ঠাকুরপো, তারা যদি সিতাংশুর সঙ্গে অনিতার বিয়ে ঠিক করে থাকে সে কি আমার দোষ? আজ পাকাদেখা, উনি বলচেন যাবেন না। তার মানে আমাকেও যেতে দেবেন না।

দাদা গর্জিয়া উঠিলেন—তুমি জানতে না বলতে চাও? আমাদের সঙ্গে এ জুচ্চুরি চালাবার এতদিন কি দরকার ছিল?

কথাটা সহসা ধরিতে না পারিয়া বিজয় হতবুদ্ধি হইল, কিন্তু বুঝিতেও বিলম্ব হইল না, কহিল, রসো রসো। হয়েচে কি বল ত? অনিতার সঙ্গে সিতাংশু ঘোষালের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়েছে? আজই তার পাকাদেখা? I am thrown completely overboard!

দাদা হুঙ্কার দিলেন—হুঁ! আর উনি বলতে চান কিছুই জানতেন না!

প্রভা কাঁদিয়া বলিল, আমি কি করতে পারি ঠাকুরপো। দাদা রয়েচেন, মা রয়েচেন, মেয়ে নিজে বড় হয়েচে, তারা যদি কথা ভাঙ্গে আমার দোষ কি?

দাদা বলিলেন, দোষ এই যে তারা ধাপ্পাবাজ ভণ্ড মিথ্যেবাদী। একদিকে কথা দিয়ে আর একদিকে গোপনে টোপ ফেলে বসেছিল। এখন লোকে মুখ টিপে হাসবে,—আমি ক্লাবে পার্টিতে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

প্রভা তেমনি কান্নার সুরে বলিতে লাগিল, এমনধারা কি আর হয় না? তাতে তোমার লজ্জা কিসের?

আমার লজ্জা সে তোমার বোন বলে। আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই জোচ্চোর বলে। তাতে তোমারও একটা বড় অংশ আছে বলে।

দাদার মুখের প্রতি চাহিয়া এবার বিজয় হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া প্রভার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া প্রসন্নমুখে কহিল, বৌদি, দাদা যত গর্জনই করুন, আমি রাগ বা দুঃখ ত করবই না, বরঞ্চ সত্যিই যদি এতে তোমার অংশ থাকে, তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। মুখ ফিরাইয়া বলিল, দাদা, রাগ করা তোমার সত্যিই বড় অন্যায়। এ ব্যাপারে কথা দেওয়ার কোন অর্থ নেই যদি পরিবর্তনের সুযোগ থাকে। বিয়েটা ত ছেলেখেলা নয়। সিতাংশু আই. সি. এস. হয়ে ফিরেচে। সে একটা বড় দরের লোক। অনিতা দেখতে ভালো, বি. এ. পাস করেছে—আর আমি? এখানেও পাস করিনি, বিলেতেও সাত-আট বচ্ছর কাটিয়ে একটা ডিগ্রি যোগাড় করতে পারিনি,—সম্প্রতি কাঠের দোকানে কাঠ বিক্রি করে খাই, না আছে পদ-গৌরব, না আছে খেতাব। অনিতা কোন অন্যায় করেনি দাদা।

দাদা সরোষে কহিলেন, একশো বার অন্যায় করেছে। তুই বলতে চাস এতে তোর কোন কষ্টই হয়নি?

বিজয় কহিল, দাদা, তুমি গুরুজন—মিথ্যে বলব না—এই তোমার পা ছুঁয়ে বলচি, আমার এতটুকু দুঃখ নেই। নিজের পুণ্যে ত নয়, কার পুণ্যে ঘটল জানিনে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমি বেঁচে গেলুম। বৌদি, চল আমি তোমাকে নিয়ে যাই। দাদার ইচ্ছে হয় রাগ করে ঘরে বসে থাকুন, কিন্তু আমরা চল তোমার বোনের পাকাদেখায় পেট-পুরে খেয়ে আসি গে।

প্রভা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করচো ঠাকুরপো?

না বৌদি, ঠাট্টা করিনি। আজ একান্ত-মনে তোমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি, তোমার বরে ভাগ্য যেন এবার আমাকে মুখ তুলে চায়। কিন্তু আর দেরি ক'রো না, তুমি কাপড় পরে নাও, আমিও অফিসের পোশাকটা ছেড়ে আসি গে।—বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল, দাদা বলিলেন, তোর নেমন্তন্ন নেই, তুই সেখানে যাবি কি করে?

বিজয় থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তা বটে। তারা হয়ত লজ্জা পাবে। কিন্তু বিনা আহ্বানে কোথাও যেতেই আজ আমার সঙ্কোচ নেই, ছুটে গিয়ে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, অনিতা, তুমি আমাকে ঠকাও নি, তোমার উপর আমার রাগ নেই, জ্বালা নেই,—প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও। দাদা, আমার মিনতি রাখো, রাগ করে থেকো না, বৌদিদিকে নিয়ে যাও, অন্ততঃ আমার হয়েও অনিতাকে আশীর্বাদ করে এসো তোমরা।

দাদা ও বৌদি উভয়েই হতবুদ্ধির মত তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল বিজয়ের মুখের 'পরে বিদ্রূপের সত্যই কোন চিহ্ন নাই, ক্রোধের অভিমানের লেশমাত্র ছায়া কণ্ঠস্বরে পড়ে নাই—সত্যই যেন কোন সুনিশ্চিত বিপদের ফাঁস এড়াইয়া মন তাহার অকৃত্রিম পুলকে ভরিয়া গেছে। বোনের কাছে এ ইঙ্গিত উপভোগ্য নয়, অপমানের ধাক্কায় প্রভার অন্তরটা সহসা জ্বলিয়া গেল, কি যেন একটা বলিতেও চাহিল, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া রহিল।

বিজয় বলিল, বৌদি, আমার সকল কথা বলবার আজও সময় আসেনি, কখনো আসবে কিনা তাও জানিনে, যদি আসে কোনদিন, সেদিন কিন্তু তুমিও বলবে, ঠাকুরপো, তুমি ভাগ্যবান ভাই। তোমাকে আশীর্বাদ করি।